২৯-০৫-১৯ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো কারোর নাম অথবা রূপে ফেঁসে যাওয়া, অন্তর্মুখী হয়ে এই ব্যাধিকে চেক করো এবং এর থেকে মুক্ত হও"

প্রশ্ন :- নাম-রূপের ব্যাধিকে নাশ করার উপায় কি? এই ব্যাধির দ্বারা কি কি ক্ষতি হয়?

উত্তর :- নাম-রূপের ব্যাধিকে নাশ করার জন্য কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের প্রীত রাখো। যদি যোগের সময়ে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় কিংবা কোনো দেহধারীর কথা স্মরণে আসে, তাহলে বাবাকে সবকিছু ঠিকঠাক শোনাও। সত্যিকথা বললে বাবা ক্ষমা করে দেবেন। সার্জেনের কাছে ব্যাধিকে লুকিও না। বাবাকে শোনালে নিজেও সাবধান হয়ে যাবে। কারোর নাম-রূপে বুদ্ধি আটকে থাকলে বাবার সাথে বুদ্ধি যুক্ত হবে না। তখন সে সার্ভিসের পরিবর্তে ডিস-সার্ভিস করে। বাবার নিন্দা করে। এইরকম নিন্দুকেরা খুব কঠোর শাস্তির ভাগীদার হয়।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে বাবার কাছ থেকেই সবাই উত্তরাধিকার পাবে। ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই কখনো উত্তরাধিকার পায় না। কোনো ভাই অথবা বোনের কাছে তো সকলের খবর থাকে না। বাপদাদার কাছেই সকল খবরাখবর আসে। এটাই বাস্তব। প্রত্যেককেই দেখতে হবে যে আমি কতটা বাবাকে স্মরণ করি? আমি কারোর নাম-রূপে আটকে নেই তো ? আমার অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি কেমন পরিসরে ঘোরাফেরা করে ? আত্মা নিজে জানে যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করা আবশ্যক। আমার বৃত্তি কেবল শিববাবার দিকেই যায়, না কি অন্য কারোর নাম-রূপের দিকে যায়? যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা অনুভব করে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমার বুদ্ধি কেবল বাবা ছাড়া আর অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায় না তো? ব্যবসা, ঘর-গৃহস্থ কিংবা আত্মীয়-বন্ধুদের দিকে বুদ্ধি চলে যায় না তো? অন্তর্মুখী হয়ে এইসব চেক করতে হবে। যখন এখানে এসে বসো, তখন এইসব বিষয়গুলো চেক করতে হবে। এখানে তো সামনে কেউ না কেউ বসে যোগ করে। সেও নিশ্চয়ই শিববাবা-কেই স্মরণ করছে। এমন নয় যে সন্তানদের স্মরণ করছে। স্মরণ তো শিববাবা-কেই করতে হবে। এখানে তো শিববাবা-কেই স্মরণ করতে বসেছ। হয়তো কেউ চোখ খুলে বসে আছে, কেউ বা হয়তো চোখ বন্ধ করে বসে আছে। এই বিষয়টা তো বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে বাবা আমাদেরকে কি বোঝান? আমাদেরকে তো কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে। এখানে যে বসে আছে, সে তো কেবল শিববাবা-কেই স্মরণ করছে। সে তোমাদেরকে দেখে না। কারন কারোর অবস্থা সম্পর্কেই তার কোনো ধারণা নেই। বাবার কাছে প্রত্যেকের খবর আসে। তিনি জানেন যে কে কে ভালো বাচ্চা, কাদের বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার আছে। এইরকম বাচ্চাদের বুদ্ধি অন্য কোনো দিকে যায় না। কোনো কোনো বাচ্চার অন্যদিকে বুদ্ধি চলে যায়। তারপর মুরলি শুনতে শুনতে চেঞ্জ হয়ে যায়। অনুভব হয় যে এটা ঠিক নয়। আমার দৃষ্টি-বৃত্তিও খারাপ ছিল। এখন সেটাকে শোধরাতে হবে। খারাপ বৃত্তিকে ত্যাগ করতে হবে। এইসব বিষয় তো বাবা-ই বোঝান। ভাই-ভাইকে বোঝাতে পারেনা। বাবা পরখ করে দেখেন যে কোন বাচ্চার দৃষ্টি-বৃত্তি কেমন। বাবাকে সবাই নিজের অন্তরের খবর শোনায়। শিববাবাকে যখন শোনায়, তখন এই ঠাকুরদাদাও বুঝতে পেরে যান। যখন কেউ এসে শোনায় কিংবা তাকায়, তখন জানতে পারা যায়। যতক্ষণ কেউ শোনাবে না, ততক্ষণ তো জানা যাবে না যে এই বাচ্চা কি করে। কারও কারও

চালচলন, সেবা ইত্যাদি দ্বারা বোঝা যায় যে এর মধ্যে অনেক দেহ অভিমান রয়েছে, এর মধ্যে কম দেহ অভিমান রয়েছে, কিংবা এর চালচলন ঠিক নয়। কারোর না কারোর নাম-রূপে ফেঁসে থাকে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - কারোর দিকে কি বুদ্ধি ধাবিত হয়? কেউ কেউ সত্যিকথা বলে দেয়। কেউ কেউ আবার এতটাই নাম-রূপে ফেঁসে থাকে যে বাবার কাছেও গোপন করে যায়। এতে নিজেরই ক্ষতি করে। বাবাকে বলে দিলে বাবা ক্ষমা করে দেন এবং সে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে যায়। অনেকেই এমন আছে যারা নিজের বৃত্তির কথা ঠিকঠাক শোনায় না। তাদের লজ্জা হয়। যেমন উল্টোপাল্টা কাজ করলে সার্জেনকে বলে না। কিন্তু লুকিয়ে রাখলে তো ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। এখানেও এইরকম হয়। বাবাকে বলে দিলে হাল্কা হয়ে যায়। যদি ভেতরে রেখে দাও, তাহলে ভারী হয়ে যাবে। বাবাকে বলে দিলে দ্বিতীয়বার আর এইরকম করবে না। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু যদি না বলো, তবে ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাবে। বাবা জানেন যে কোন বাচ্চা খুব সেবাধারী, কোন বাচ্চার কেমন যোগ্যতা, কে কতটা সেবারত থাকে ... ইত্যাদি। কারোর সাথে ফেঁসে নেই তো ? প্রত্যেকের জন্মপত্র দেখেন এবং তার সাথে ততটাই প্রীত রাখেন, আকর্ষণ করেন। কোনো কোনো বাচ্চা তো খুব ভালো সেবা করে। ওদের কখনোই অন্য কোনদিকে বুদ্ধি যায় না। আগে হয়তো যেত, কিন্তু এখন সাবধান হয়ে গেছে। এইরকম বাচ্চারা বলে - বাবা, আমি এখন সাবধান হয়ে গেছি। আগে অনেক ভুল করতাম। ওরা বুঝতে পারে যে দেহ-অভিমানের বশীভূত হলে তো কেবল ভুল কর্মই হবে। তখন পদ কমে যাবে। হয়তো অন্য কেউ জানতে পারে না, কিন্তু তার পদ অবশ্যই কমে যায়। উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য আন্তরিক ভাবে নির্মল থাকা অতি আবশ্যক। ওদের বুদ্ধি অতি নির্মল থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও নির্মল ছিল, তাইতো তারা উঁচু পদ পেয়েছিল। কোনো কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে তো বোঝা যায় যে তার নাম-রূপের দিকে বুদ্ধি যায়, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকে। তাই তার পদ কমে যায়। রাজা থেকে কাঙাল পর্যন্ত ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদ রয়েছে। এইরকম কেন হয়? এটাও বুঝতে হবে। ক্রমানুসারে তো অবশ্যই হবে। কলা ক্রমশ কম হয়। যে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে, সে-ই তারপরে ১৪ কলা বিশিষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে একটু একটু করে কলা কমতে কমতে ক্রমশ পতন হবে। ১৪ কলা থাকলেও ভালো থাকে, কিন্তু যখন বামমার্গে চলে যায় তখন বিকারী হয়ে যায়, আয়ুও কমে যায়। তারপর রজো এবং তমোগুণী হয়ে যায়। এইভাবে ক্রমশ পুরাতন হয়। আত্মা এবং শরীর ক্রমশ পুরাতন হতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেই এখন এই সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। কিভাবে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থেকে অধঃপতন হতে হতে মানুষ হয়ে যায়। দেবতাদের শ্রীমৎ হয় না। বাবা এসেই শ্রীমৎ দেন এবং এরপর ২১ জন্ম আর কোনো মতের প্রয়োজন হয় না। এই ঈশ্বরীয় শ্রীমৎ ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে এবং পরে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন তোমরা রাবণের মতামত প্রাপ্ত করো। দেবতাদের বামমার্গে যাওয়ার চিত্রও দেখানো হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এইরকম হয় না। দেবতারা যখন বামমার্গে যায়, তখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে।

বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন তো তোমাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে। এটা পুরাতন দুনিয়া। ড্রামাতে (অবিনাশী সৃষ্টি নাটকে) এটাই আমার পার্ট - পুরাতন দুনিয়াকে নুতন বানানো। এটা তো তোমরা বুঝেছ। দুনিয়ার মানুষ কিছুই জানে না। তোমরা এত বোঝানো সত্ত্বেও কেউ কেউ হয়তো উৎসাহ দেখায়, কেউ কেউ আবার নিজের মতামত শোনায়। যখন এই লক্ষ্মী নারায়ণ ছিল, তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই ছিল। পবিত্রতাই হল মুখ্য বিষয়। মানুষ তো জানেই না যে সত্যযুগে দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিল। ওরা মনে করে যে দেবতাদেরও সন্তান ছিল। কিন্তু ওখানে যোগবলের

দ্বারা কিভাবে জন্ম হয় সেটা কেউই জানে না। মানুষ বলে – সারা জীবন পবিত্র থাকলে সন্তানের জন্ম কিভাবে হবে? ওদেরকে বোঝাতে হবে যে এইসময়ে পবিত্র থাকলে আগামী ২১ জন্ম পবিত্র থাকা সম্ভব। অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারে আমরা নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করছি। এটা বাবার শ্রীমৎ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার গায়ন রয়েছে। এখন সবাই মানুষ। এরপর এরাই দেবতা হবে। শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এখন দৈব গভর্নমেন্ট স্থাপন করছি। এর জন্য পবিত্রতা হল মুখ্য বিষয়। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। আত্মাই পাথরের মতো বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে। এটা একেবারে স্পষ্ট ভাবে বলো। বাবা এসেই সত্যযুগের দৈব গভর্নমেন্ট স্থাপন করেছিলেন যাকে প্যারাডাইস বলা হয়। বাবা এসেই মানুষকে দেবতা বানিয়েছিলেন। মানুষ তো পতিত হয়ে গেছিল। তাদেরকে পতিত থেকে কিভাবে পবিত্র বানিয়েছিলেন ? তিনি বাচ্চাদেরকে বলেছিলেন – একমাত্র আমাকে স্মরণ করলেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। এই কথাটা তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকে শোনালেই তার হৃদয় স্পর্শ করবে। এখন পতিত থেকে কিভাবে পবিত্র হবে ? নিশ্চয় বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অন্যান্য সব কিছু থেকে বুদ্ধি ছিন্ন করে কেবল বাবার সাথেই বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে। তাহলেই মানুষ থেকে দেবতা হওয়া সম্ভব। এভাবে বোঝাতে হবে। তোমরা যাকিছু বুঝিয়েছ, সেটা ড্রামা অনুসারে ঠিকই আছে। এটা তো বোঝাই যায় যে দিনে দিনে বোঝানোর জন্য আরো নুতন নুতন পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। আসল কথা হল আমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হব ? বাবা বলছেন – সকল দৈহিক ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমাকেই স্মরণ করো। কেবল তোমরা বাচ্চারাই এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথা জানো। আমরা এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ হয়েছি। বাবা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ না হলে আমরা দেবতা হব কিভাবে ? ব্রহ্মাবাবাও পুরো ৮৪ বার জন্ম নেন। তারপর তিনিই আবার প্রথমে জন্ম নেন। বাবা এসে প্রবেশ করেন। সুতরাং আসল কথা একটাই – নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। দেহ-অভিমানের বশীভূত হলে কোথাও না কোথাও বুদ্ধি আটকে থাকে। সবাই তো দেহী-অভিমানী হতে পারবে না। নিজেকে যথাযথ ভাবে চেক করে দেখ যে আমি কখনো নিজেকে দেহ মনে করে তার (দেহভানের) বশীভূত হই না তো ? আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হয় না ? উল্টোপাল্টা চালচলন হয় না তো ? অনেকের দ্বারা-ই এইরকম হয়ে থাকে। ওরা অন্তিমে অনেক শাস্তি পাবে। হয়তো এখনো কর্মাতীত অবস্থা হয়নি। কর্মাতীত অবস্থা হলে সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। শাস্তির হাত থেকেও রেহাই পেয়ে যায়। চিন্তন করবে কিভাবে ক্রমানুসারে রাজা হবে। নিশ্চয়ই কারোর কম পুরুষার্থ থাকবে। তাই সে শাস্তি খাবে। গর্ভজেলে তো আত্মাই শাস্তি ভোগ করে। আত্মা যখন গর্ভে থাকে, তখন সে মিনতি করে – আমাকে এখান থেকে বার করো, আমি আর পাপ করব না। আত্মাই শাস্তি ভোগ করে। আত্মা-ই কর্ম অথবা বিকর্ম করে। এই শরীরটা কোনো কর্মের নয়। সুতরাং মুখ্য বিষয় হলো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করতে হবে। যাতে কেউ বুঝতে পারবে যে আত্মাই সকল কর্ম করে। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে। তাই জন্যই এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করছ। এরপর আর কখনো এই জ্ঞান পাবে না। যে আত্ম-অভিমানী হবে, সে সবাইকে ভাই রূপে দেখবে। কোনো শারীরিক দৃষ্টি থাকবে না। আত্ম-অনুভূতিতে থাকলে শরীরের প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। তাইজন্যেই বাবা বলেন যে এটা খুব উঁচু স্টেজ। ভাই-বোন নিজেদের মধ্যে ফেঁসে গেলে খুব ডিস-সার্ভিস করে দেয়। আত্ম-অভিমানী হওয়াটাই পরিশ্রমের। পড়াশুনাতে বিভিন্ন সাবজেক্ট থাকে। বুঝতে পারা যায় যে আমি হয়তো এই বিষয়ে ফেল করে যাব। ফেল হয়ে গেলে অন্য সাবজেক্টেও ঢিলে দিয়ে দেয়। এখন তোমরা আত্মারা বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা সোনার পাত্র হয়ে যাচ্ছ। যোগ না করলে নলেজও কম থাকবে। তখন অতটা শক্তি থাকবে না। যোগবল অতটা থাকে না। এটা ড্রামাতেই রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদেরকে

নিজ অবস্থার অনেক উন্নতি করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে আমি সারাদিনে কোনো অনুচিৎ কাজ করিনি তো ? এইরকম কোনো অভ্যাস থাকলে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনে মায়া পুনরায় ভুল করিয়ে দেয়। এইরকম সূক্ষ্ম বিষয় তো চলতেই থাকে। এটা পুরোপুরি গুপ্ত জ্ঞান। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। তোমরা বলো যে আমরা নিজেদের সব খরচ নিজেরাই করি। অন্যের অর্থ খরচ করে কি কিছু করা সম্ভব ? বাবা তাই সবসময় বলেন - কিছু চাওয়ার থেকে মরণ শ্রেয়। সহজে পাওয়া গেলে সেটা হল দুধ। কিন্তু যদি চাইতে হয়, তাহলে সেটা হল জল। কারোর কাছ থেকে কিছু চাইলে সে তখন বাধ্য হয়ে কিছু দেয়। ওটা তখন জল হয়ে যায়। আর যদি জোর করে নেওয়া হয় তবে সেটা হল রক্ত। কেউ কেউ খুব ঝামেলা করে। এইভাবে যদি পাওনা আদায় করা হয় তবে সেটা রক্তসম হয়ে যায়। এইভাবে পাওনা আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। দান করে আবার ফেরত নেওয়ার বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের একটা কাহিনী রয়েছে। এরকমও করবে না। নিজের জন্য একটা অংশ রেখে দাও যেটা তোমার কাজে আসবে। বাচ্চাদেরকে এতটা পুরুষার্থ করতে হবে যাতে অন্তিমে কেবল বাবা এবং স্বদর্শন চক্র স্মরণে থাকে। তাহলে শরীর ত্যাগ করা সম্ভব হবে। তাহলেই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। এমন নয় যে অন্তিম সময়ে স্মরণ করতে পারবে এবং তখন এইরকম অবস্থা হয়ে যাবে। না, এখন থেকেই পুরুষার্থ করতে করতে অন্তিম পর্যন্ত ঐরকম অবস্থা বানাতে হবে। এমন যেন না হয় যে অন্তিমে অন্যদিকে বৃত্তি চলে গেল। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ কাটবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে পবিত্রতার বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয়। পড়াশুনাতে এতটা পরিশ্রম করতে হয় না। এই বিষয়ে বাচ্চাদেরকে মনোযোগী হতে হবে। তাই বাবা বলেন - প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করো - আমি কোনো অনুচিৎ কাজ করিনি তো ? নাম-রূপে ফেঁসে যাই নি তো ? কাউকে দেখে পাগল হয়ে যাই না তো ? কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো অনুচিৎ কাজ করি না তো ? পুরাতন শরীরের প্রতি কোনো প্রীতি থাকা উচিত নয়। এটাও এক প্রকার দেহ-অভিমান। অনাসক্ত হয়ে থাকতে হবে। কেবল একজনের সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা থাকা উচিত। বাকি সবার সাথে যেন অনাসক্ত ভালোবাসা থাকে। সন্তান-সন্ততি থাকলেও কারোর প্রতিই যেন আসক্তি না থাকে। তোমরা জানো যে এখন যা কিছু দেখছ, সেই সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই এইসব বিষয়ে আর ভালোবাসা থাকে না। কেবল একজনের সাথেই ভালোবাসা থাকে। বাকি সব নাম মাত্র, অনাসক্ত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) আপন বৃত্তিকে অতি শুদ্ধ এবং পবিত্র বানাতে হবে। কোনো উল্টোপাল্টা অনুচিত কাজ করা উচিত নয়। খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোথাও বুদ্ধিকে ফাঁসানো যাবে না।

২) কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। বাকি সবার সাথে অনাসক্ত, নামমাত্র ভালোবাসা যেন থাকে। এমন আত্ম-অভিমানী অবস্থা বানাতে হবে যাতে শরীরের প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে।

বরদান :- কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিবর্তন করে সবকিছুতে অলিপ্ত এবং পরমাত্ম-প্রিয় ভব

পরমাত্ম-প্রীতি হল ব্রাহ্মণ জীবনের ভিত্তি। কিন্তু সেই ভালোবাসা তখনই পাওয়া যাবে যখন অলিপ্ত হবে। যদি প্রবৃত্তিতে আছ, তাহলেও সেবার জন্যেই রয়েছ। কখনোই এইরকম মনে করবে না যে হয়তো কোনো হিসাব কিংবা কর্মবন্ধন রয়েছে। এটাকে সেবা বলেই মনে করো। সেবার বন্ধনে আবদ্ধ হলে কর্মবন্ধন কেটে যায়। সেবাভাব না থাকলেই কর্মবন্ধন আকর্ষণ করে। যেখানে কর্মবন্ধন আছে, সেখানেই দুঃখের আভাস আছে। সেবার বন্ধনে তো কেবল খুশিই আছে। তাই কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিবর্তন করে অলিপ্ত অথচ প্রিয় থাকলেই পরমাত্ম-প্রিয় হয়ে যাবে।

স্লোগান :- যে স্ব-স্থিতির দ্বারা পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারে, সে-ই হলো শ্রেষ্ঠ আত্মা।